এবনে গোলাম সামাদ
রচনাসংগ্রহ ৩

এবনে গোলাম সামাদ
রচনাসংগ্রহ ৩

পরিলেখ

এবনে গোলাম সামাদ
রচনাসংগ্রহ ৩

প্রকাশক	□	**পরিলেখ** ইউনিক প্যালেস (৭ম তলা) মির্জাপুর, মতিহার, রাজশাহী-৬২০৬ ঢাকা অফিস: ২৭, রাসেল সেন্টার হাটখোলা, ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩
প্রথম প্রকাশ	□	একুশে বইমেলা ২০২২
গ্রন্থস্বত্ব	□	লেখক
প্রচ্ছদ	□	মনিরুজ্জামান মনির
অক্ষরসজ্জা	□	আনোয়ার হোসেন এ্যাকটিভ কম্পিউটার, রাজশাহী
মুদ্রণ	□	মৌমিতা প্রিন্টিং প্রেস বাংলাবাজার, ঢাকা
মূল্য	□	আটশত টাকা মাত্র

Rochonasangraho 3 by Ebne Golam Samad
Published by Porilekh Rajshahi-Dhaka, Cover: Moniruzzaman Monir
Date of Publication: February 2022, Price: 800 Taka only

প্রসঙ্গ কথা

নতুন এক বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে আমরা এবার স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করলাম। পরিবর্তমান এই বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়া বা এর মোকাবেলায় আমাদের আশু কর্তব্য একটি স্বাধীন, স্বাবলম্বী ও মর্যাদাবান জাতি বিনির্মাণ করা। এর জন্য প্রয়োজন গণতন্ত্রের চর্চা, আইনের শাসন, এবং সর্বোপরি জাতিসত্তার বিকাশ। বিগত অর্ধশত বছরে অগণতান্ত্রিক, কর্তৃত্ববাদী, বশংবদ ও দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতি, আত্মকলহ এবং সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব এতে বাধা সৃষ্টি করেছে। বিশেষত জাতিসত্তার বিকাশ দিশা হারিয়েছে বারবার। আমাদের বুদ্ধিজীবি সমাজ এক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে শুধু যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন তাই নয়, বরং অধিকাংশ সময় তারা এসব অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মকাণ্ডের সক্রিয় অংশীদার হয়েছেন। তবে আশার কথা একেবারেই হাতে গোণা হলেও কয়েকজন বুদ্ধিজীবি এই বশংবদ বুদ্ধিবৃত্তিক স্রোতোধারার বাইরে থেকে জাতিকে লক্ষ্যাভিমুখী করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। প্রফেসর ড. এবনে গোলাম সামাদ এদের মধ্যে অন্যতম।

ড. সামাদ একজন বহুমাত্রিক জ্ঞানসাধক, আপসহীন বুদ্ধিজীবী এবং দেশপ্রেমিক লেখক। তিনি জ্ঞানতাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আমাদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তার পরিচয়কে তুলে ধরেছেন বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে। একজন সচেতন ও দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে স্বদেশের স্বার্থের প্রশ্নে আপসহীন ভূমিকা রেখেছেন সব সময়। তাঁর কলম বিচিত্র পথের অনুগামী হয়েছে। বিজ্ঞান, শিল্পকলা, দর্শন, নৃতত্ত্ব, ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, সংস্কৃতি- সবক্ষেত্রেই তাঁর অবাধ ও স্বচ্ছন্দ বিচরণ। মানুষ ও স্বজাতির তীব্র কল্যাণচেতনায় তিনি ক্রমাগত চিন্তাশীলতা ও অনুসন্ধিৎসার আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর জ্ঞানচর্চা ও লেখালেখির ক্ষেত্র বিচিত্র হলেও তার প্রধান অভিমুখ ছিল বৃহত্তর অর্থে বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় অনুসন্ধান, উন্মোচন ও বিকাশ এবং বিশেষত স্বাধীন বাংলাদেশের স্বার্থ, স্বকীয়তা ও মর্যাদা অর্জন ও রক্ষার বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই। কিন্তু তিনি সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ বা সম্প্রদায়কেন্দ্রিক মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেননি। তিনি সবকিছুকে দেখেছেন ও বিশ্লেষণ করেছেন বিজ্ঞানসম্মতভাবে।

যৌক্তিক, বৌদ্ধিক, ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক, ভাষিক ও সাহিত্যিক মাধ্যমের সাহায্য নিয়ে ড. সামাদ প্রমাণ দিয়েছেন বাঙালি মুসলমান একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তার অধিকারী। তার সংস্কৃতি ও নৃতত্ত্ব এবং উন্মেষ ও বিকাশে বহু জাতির মিশ্রণ ও ভূমিকা থাকলেও ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় বাঙালি মুসলমান একক ও স্বাধীন সত্তায় উজ্জ্বল। তার আদর্শ,

বিশ্বাস, জীবনচেতনা, রীতি-নীতি, প্রকাশভঙ্গি, শিল্পচেতনা, সর্বোপরি সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের একটা পৃথক ইতিবৃত্ত আছে। ফলে একটা আলাদা জনসমাজ গড়ে উঠেছে ভারতীয় উপমহাদেশের বৃহৎ জনসমাজে। সে পথেই বাঙালি মুসলমানের জাতীয়তাবোধ ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ঘোষণার বাসনা জাগ্রত ও লালিত হয়েছে এবং তার থেকেই অভ্যুদয় ঘটেছে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের। অতএব এর অস্তিত্ব ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই জাতীয়তাবোধের লালন ও বিকাশের ওপর। দেশপ্রেম এবং স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তির এমন সম্মিলন বাংলাদেশে বিরল। তাঁর এসব পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ছড়িয়ে আছে তাঁর অসংখ্য গ্রন্থ, প্রবন্ধ, কলাম এবং অন্যান্য রচনায়।

ড. সামাদের রচনাসম্ভার বিপুল এবং বিচিত্র। তাঁর কয়েকটি বই আমরা ইতোপূর্বে প্রকাশ করেছি। একটি 'নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ' প্রকাশের ব্যাপারেও আমরা তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তিনি সম্মতি প্রদান করেছিলেন। আমরা কাজও শুরু করেছিলাম। ইতোমধ্যে ২০২১ সালের ১৫ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর সকল মহল থেকে দাবি ওঠে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ এবং অগ্রন্থিত রচনাগুলো একত্র করে রচনাসমগ্র প্রকাশ করা হোক। এটা আমাদের জন্য একটি দুরূহ কাজ। তবুও আমরা উদ্যোগী হয়েছি প্রথমত ড. সামাদ এবং তাঁর শুভানুধ্যায়ী ও ভক্তদের আগ্রহকে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য, এবং সর্বোপরি তাঁর রচনাবলী বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ও মর্যাদাবান জাতি গঠনের লড়াইয়ে রসদ জোগাবে এই প্রত্যাশায়।

দীর্ঘকাল ধরে লেখা ড. সামাদের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বিপুল রচনাবলীর মধ্য থেকে বর্তমান 'রচনাসংগ্রহ ৩'-এর জন্য আমরা বেছে নিয়েছি *ইসলামী শিল্পকলা*, *বাংলাদেশে আদিবাসী এবং জাতি ও উপজাতি* এবং *বাংলাদেশ : মানুষ ও ঐতিহ্য* তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ও বেশকিছু অগ্রন্থিত রচনা। এসব গ্রন্থ ও রচনার মধ্যে পাঠক ড. সামাদের গভীর জ্ঞান, বুদ্ধিবৃত্তিক ও ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠা এবং দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠার পরিচয় পাবেন।

নাজিব ওয়াদুদ
প্রকাশক
পরিলেখ প্রকাশনী

সূ চি প ত্র

ইসলামী শিল্পকলা

অবতারণার আগে

প্রসঙ্গ অবতারণা

প্রথম ভাগ : প্রারম্ভিক বিষয়

প্রথম অধ্যায় : প্রাচী ও প্রতীচী

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইসলামী শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য

তৃতীয় অধ্যায় : ইসলামের ইতিহাসের কয়েক কথা

দ্বিতীয় ভাগ : ইতিহাস

৪র্থ অধ্যায় : উমাইয়া আমল

৫ম অধ্যায় : আব্বাসি আমল

৬ষ্ঠ অধ্যায় : ফাতেমী মিসর

৭ম অধ্যায় : সেলজুক পারস্য ও মেসোপটেমিয়া

৮ম অধ্যায় : সেলজুক এশিয়া মাইনর

৯ম অধ্যায় : মোঙ্গল আমলে পারস্য

১০ম অধ্যায় : তৈমূর ও তার বংশধর

১১ম অধ্যায় : মামলুক মিসর ও সিরিয়া

১২শ অধ্যায় : মুর ও মাঘারিব।

১৩ম অধ্যায় : ওসমানী তুর্ক

১৪শ অধ্যায় : সাফাভী পারস্য

১৫শ অধ্যায় : ইন্দো-মুসলিম রীতি

তৃতীয় ভাগ : বাংলাদেশ ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চল

১৬শ অধ্যায় : ভূমি-পরিচয়

১৭শ অধ্যায় : বাংলার ইসলামী শিল্পকলা

চতুর্থ ভাগ : আনুষঙ্গিক আলোচনা

শিল্পকলা : সংজ্ঞা ও স্বরূপ

মুসলিম অধ্যুষিত দেশের মানব পরিচয়

ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা

তুলনামূলক সন-তারিখ

সাধারণ গ্রন্থপঞ্জী

পরিশিষ্ট
কিছু উপদেশ
শরীয়ত ও শিল্পকলা
পটুয়া
ইসলামী ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত সন-পঞ্জী
রেখাচিত্র
আলোকচিত্র

বাংলাদেশে আদিবাসী এবং জাতি ও উপজাতি

কিছু সাধারণ কথা
ইতিহাসের প্রেক্ষিতে তিন পার্বত্য জেলা
উপজাতি সমস্যা জটিল করা হচ্ছে
পাহাড়ি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা
ইতিহাসের পটে আরাকান-বাংলাদেশ
রোহিঙ্গা মুসলিম সমস্যা
উপজাতি নিয়ে রাজনীতি
উপজাতি প্রসঙ্গে আরও কথা
উপজাতি সংস্কৃতি সংরক্ষণ প্রসঙ্গে
আদিবাসী দিবস
বাংলাদেশে বৌদ্ধ মুসলিম সম্পর্ক
চাকমা রাজনীতিতে হিন্দুত্ব
মহেশখালী দ্বীপের আয়তন বাড়ছে
জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে
বাংলাদেশে বাংলাভাষী মানুষই আদিবাসী
বিবিধ তথ্য

বাংলাদেশ : মানুষ ও ঐতিহ্য

মানব-পরিচয়
ভাষার-বিচার
প্রাক ও প্রায়-ইতিহাস
ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে বাংলা
জাতি-রাষ্ট্র বাংলাদেশ

অগ্রন্থিত রচনা

আমরা যে কারণে রবীন্দ্র বিরোধি
রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধান প্রসঙ্গে
আরাকানে রোহিঙ্গা নিধন
রুশ বিপ্লব নিয়ে অবান্তর উচ্ছাস
কথিত রুশবিপ্লব নিয়ে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের ভাবালুতা
দার্জিলিং-এ গোর্খা হাঙ্গামা
বাংলাদেশে ধান চাষে বিপর্যয়
হিন্দু জনসমাজে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা
ভারতের প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা
আমাদের জাতিসত্তা গঠনে রবীন্দ্রনাথ
জলবায়ু রক্ষার আকুতি
মানবতন্ত্রী সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার
মুক্তবুদ্ধির বহ্বাড়ম্বর
আমার জন্মদিনের পাঁচমিশালী আলোচনা
আসামে মুসলমান
আসাম এখন কোনো পথে?
রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে বাঁচাও
বাংলাদেশে মার্কসবাদ
বাংলাদেশে রুশ বিপ্লবের শতবার্ষিকী
বাংলাদেশ পাকিস্তান সম্পর্ক উন্নয়ন
কবি দার্শনিক ইকবাল
দক্ষিণ এশিয়ার ভাষা ও ভাষা সমস্যা
আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক মুজিবনগর দিবস পালন
নজরুলের জন্মজয়ন্তীতে লেখা
বহুজাতিক নদীর পানি বণ্টন
প্রণব মুখোপাধ্যায়ের চট্টগ্রাম দর্শন
উদার গণতন্ত্র বনাম বাকশাল
ইউনেসকো কি এখনও প্রয়োজনীয়
তাজমহলের স্থাপত্যশৈলী
কিরাত রাজনীতির আবির্ভাব

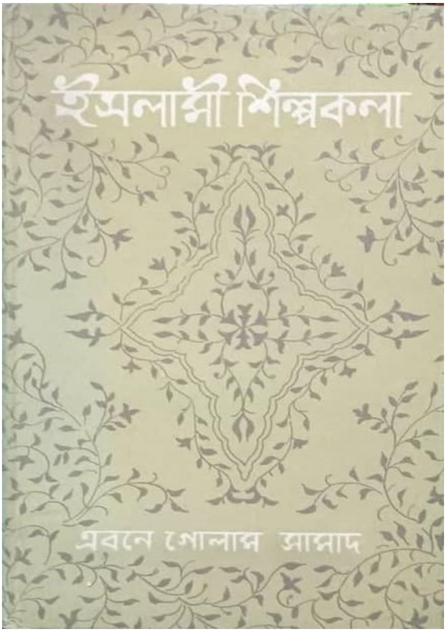

ইসলামী শিল্পকলা
প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৮
প্রকাশক : বাংলা একাডেমি

উ ৎ স র্গ

আমার শ্রদ্ধেয়া সহোদরা
দৌলতুন নেসা খাতুন-কে

অবতারণার আগে

মহানবী মুহাম্মদের (সা.) মৃত্যুর (৬৩২ খ্রি.) মাত্র প্রায় আশি বছরের মধ্যে ইসলামের পতাকাতলে আরব-মুসলমানগণ সমস্ত আরব, পারস্য, সিরিয়া, মিসর, মধ্য-এশিয়ার পশ্চিম অংশ, উত্তর-আফ্রিকা ও দক্ষিণ-স্পেন বিজয় সমাপ্ত করেন। এই বিশাল ভূখণ্ডের মধ্যে গড়ে ওঠে সাধারণ চরিত্র বৈশিষ্ট্যময় এক শিল্পধারা। এই শিল্পধারাকে সাধারণত উল্লেখ করা হয় ইসলামী শিল্পকলা হিসেবে। বর্তমান বইটি ইসলামী শিল্পকলার উদ্ভব ও প্রসারের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

ইসলামী শিল্পকলার কেন্দ্রবিন্দু হলো স্থাপত্য (Architecture)। প্রধানত স্থাপত্যকে নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে ইসলামী শিল্পকলা। কুরআনে একাকী প্রার্থনা করবার চাইতে একত্রে সমবেতভাবে প্রার্থনা করবার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে (সূরা ২, আয়াত ৪০)। তাই মুসলমান সমাজে অনেক আগে থেকেই দেখা দিয়েছে বড় ও সুন্দর করে মসজিদ নির্মাণের অনুপ্রেরণা। মসজিদকে সুন্দর করে গড়তে গিয়ে রূপ নিয়েছে ইসলামী শিল্পচেতনা (Aesthetic Sense)। পরে এই চেতনা ব্যাপ্তি পেয়েছে অন্যান্য শিল্পকর্মের ক্ষেত্রেও।

মুসলমান সমাজে ভাস্কর্য (Sculpture) বিকাশ লাভ করতে পারেনি; ভাস্কর্য থেকেছে অবহেলিত হয়ে। এর একটা বড় কারণ ধর্মবিশ্বাস। কুরআনে মূর্তি অথবা পাথরকে (আনস্বব) পবিত্রজ্ঞানে অর্চনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এসব শয়তানের সৃষ্টি; এসব থেকে দূরে থাকা মঙ্গলকর। (সূরা ৫, আয়াত ৯২)[১] তাই মানুষ ও জীবজন্তুর মূর্তি গড়া মুসলমান সমাজে উৎসাহ পেতে পারেনি। অন্যদিকে লিপিকলার (Calligraphy) ক্ষেত্রে ইসলামী শিল্পকলা দেখিয়েছে এক চরম উৎকর্ষ। এই উৎকর্ষ দেখাবার অন্যতম কারণও হলো ধর্মবিশ্বাস। কুরআনে বলা হয়েছে: "পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন; যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে। পড়, কারণ তোমার প্রভু, পরম দয়ালু; তিনিই মানুষকে শিখিয়েছেন লেখনীর ব্যবহার। তিনিই মানুষকে শিখিয়েছেন, মানুষ যা জানতো না।" (সূরা ৯৬, আয়াত ১-৪)

[১] আরবি "আনস্বব" কথাটার অনুবাদ বাংলায় করা হয় মূর্তি। কিন্তু 'আন্‌স্বব' বলতে বুঝায়, মূর্তি অথবা পূজার জন্যে ব্যবহৃত পাথর। যে ধরনের পাথরকে প্রাক-ইসলামী যুগে আরবরা পবিত্রজ্ঞানে পূজা করত। আরবে বহুপ্রকার প্রতীকোপাসনা প্রচলিত ছিল।

তাই সুন্দর হস্তাক্ষর মুসলমান সমাজে হতে পেরেছে বিশেষভাবে আদৃত, হতে পেরেছে বিশেষ অনুশীলনের বিষয়। ইসলামী শিল্পকলা নামটির যথেষ্ট সার্থকতা আছে। কারণ, মুসলমান ধর্ম এই শিল্পকলার মূল চরিত্রকে একাধিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে; একটি সাধারণ ঐক্য বা সমরূপতা প্রদানে সক্ষম হয়েছে।

ঐতিহাসিকদের অন্যতম প্রধান কাজ হল, অতীতে যেসব ঘটনা ঘটেছে তাদের যথাযথ কালক্রম (Chronology) অনুসারে বর্ণনা করা। সময়ের সারণীতে সাজিয়ে বর্ণনা করতে না পারলে অতীতের কোনো বিবরণ ইতিহাসের মর্যাদা পেতে পারে না।

শিল্পকলার ইতিহাস যারা লেখেন, তারা তাই প্রধানত দু'টি কাজ করেন। প্রথমত, তাঁরা চান কোনো শিল্পকর্মের নির্মাণকাল জানতে। দ্বিতীয়ত, তারা চান শিল্পকর্মের বৈশিষ্ট্যগুলোকে চিহ্নিত করতে। শিল্পকলার ঐতিহাসিকরা শিল্পকর্মকে তাদের নির্মাণকাল ও রীতি-বৈশিষ্ট্য (Style) অনুসারে বিভক্ত করে বর্ণনা করেন। এরপর তাঁরা চান, শিল্পকর্মের ধারাকে মানব-ইতিহাসের নানা ঘটনার বৃহত্তর পটভূমিকায় বিশ্লেষণ করতে, অতীতের নিকষে বর্তমানকে বিচার করতে এবং শিল্প-সমালোচনার একটা প্রেক্ষিত দিতে।

ইতিহাস লিখতে হলে সব ঐতিহাসিককেই কোনো না কোনো সন বা অব্দের সাহায্য নিতে হয়। ইসলামী সন হলো হিজরি। আরবিতে 'হিজরি' শব্দের অর্থ হলো 'প্রত্যাহার'। হজরত মুহাম্মদের মক্কা পরিত্যাগ করে মদিনা যাবার দিন থেকে এই অব্দ গণনা করা হয় (প্রথম হিজরি–১৫ই জুলাই, ৬২২ খ্রি.)। হিজরি চান্দ্র অব্দ। চাঁদের হিসেবে বছর হয় ৩৫৪ দিনে। অন্যদিকে খ্রিষ্টাব্দ হলো সৌর-অব্দ। এর বছর হয় ৩৬৫ দিনে। যীশুখ্রিটের (হজরত ঈসার) কল্পিত জন্মতারিখ থেকে গণনা করা হয় খ্রিষ্টাব্দ। হিজরির ৩৩ বছর, খ্রিষ্টাব্দের ৩২ বছরের সমান। হিজরি থেকে কাছাকাছি খ্রিষ্টাব্দের হিসাব বের করতে হলে হিজরির সঙ্গে ৬২২ যোগ করতে হয় এবং এই যোগফল থেকে হিজরি সনকে ৩৩ দিয়ে ভাগ করে যে ভাগফল পাওয়া যায়, তা বিয়োগ করতে হয়। যেহেতু আমাদের দেশে এখন খ্রিষ্টাব্দই বেশি প্রচলিত, তাই আমরা হিজরি সনের পরিবর্তে খ্রিষ্টাব্দ ব্যবহার করেছি। যাকে বলে 'বঙ্গাব্দ' তা-ও সৌর-সন। খ্রিষ্টাব্দ থেকে কাছাকাছি বঙ্গাব্দ পেতে হলে খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৫৯৩ বিয়োগ করতে হবে।

বর্তমান বইটি ইসলামী শিল্পকলার ইতিহাসের; কিন্তু এই শিল্পকলার ইতিহাস আলোচনা করতে হলে ইসলাম ও তার সম্প্রসারণের ইতিবৃত্তও কিছু বিবৃত করতে হয়। তাই এই বইতে ইসলাম ও তার সম্প্রসারণের ইতিহাস প্রসঙ্গেও কিছু কিছু কথা আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এই আলোচনা করা হয়েছে শিল্পকলার ইতিহাস বুঝবার জন্যে– ধর্ম ও ইসলামের ইতিহাসের ব্যাখ্যা পাবার জন্যে নয়।

লেখকের বিশ্বাস, যা কিছু মানুষের মনকে প্রভাবিত করে, শিল্পকর্মকেও তা নানাভাবে প্রভাবিত করে। শিল্পকর্মের (Artistic object) বিশ্লেষণ করতে হলে তাই বিশেষভাবে খোঁজ নিতে হয় একটা সমাজের মানুষের মনে জমে থাকা বিভিন্ন বিশ্বাস ও ভাবনা-ধারণার প্রকৃতির। অবশ্য এ-কথাই সব কথা নয়; শিল্পকর্মের এটা স্বতন্ত্র সত্তাও আছে। আর সেই সত্তার সঙ্গেও প্রয়োজন আছে পৃথকভাবে পরিচিত হবার। দার্শনিক ইমানুয়েল কানট (Immanuel Kant)-এর অনুসরণে বলতে হয়, শিল্পকর্ম একটি নির্মাণ। শিল্পকর্মের যদি আপন কোনো মূল্য না থাকতো, তবে মানুষ কখনও আকৃষ্ট হতো না শিল্পকর্মের প্রতি।

বর্তমান বইটি ছাত্রদের জন্যে পাঠ্যপুস্তক (Text book) হিসেবে লিখিত। ছাত্রদের জন্যে পাঠ্যবই লিখতে গেলে লেখকের কেবল নিজের কথা থাকলে চলে না, একটা বিষয়ে প্রচলিত অনেকের বক্তব্যকেই পেশ করতে হয়। একটি পাঠ্যবই লিখতে হলে নির্ভর করতে হয় একাধিক গবেষকের কাজের ওপর। এই ছোট বইটিও এই পদ্ধতির ব্যতিক্রম নয়। বর্তমান বইটিতে দৃষ্টান্ত হিসেবে যেসব শিল্পকর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের সবগুলোকেই যে লেখক নিজের চোখে দেখেছেন এমন নয়। বর্তমান বইয়ের অনেক উপকরণ বিভিন্ন প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে নেওয়া। এ বইয়ের অনেক মতামত ও মন্তব্য আসলে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের মতামত ও মন্তব্য লেখকের নিজের নয়। কিন্তু বিষয় বিন্যাসের ব্যাপারে লেখক তার আপন পরিকল্পনাকেই অনুসরণ করেছেন। বইটি যেহেতু বাংলা ভাষায় বাংলাদেশের ছাত্রদের জন্যে লেখা, তাই নানাভাবে চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে তাদের বর্তমান প্রয়োজনের উপযোগী করে তুলবার।

এই বইটি লেখককে প্রথম লিখতে অনুরোধ করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের অধ্যাপক শিল্পী রশিদ চৌধুরী। তার অনুরোধ রক্ষা করতে যেয়েই হয়েছে বইটির জন্ম। এই বইয়ের মুসাবিদা পড়ে অনেক ভুলভ্রান্তি শুধরে দিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডক্টর মুশারফ হুসেন। কিন্তু তবু ভুল থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। আর সেসব ভুলের জন্যে লেখক কেবল নিজেই দায়ী।

বাংলা ভাষায় অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতো শিল্পকলার ইতিহাস লিখতে হলেও পরিভাষা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়া বাংলা ভাষার অনেক শব্দের অর্থ নানা কারণে এখনও সুনির্দিষ্ট হতে পারেনি। অর্থ পরিস্ফুট করবার জন্যে তাই বহুস্থলেই বন্ধনীর মধ্যে ইংরাজি প্রতিশব্দ প্রদান করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও জায়গার নাম ইংরাজি অনুসারেই দেওয়া হয়েছে। তা নাহলে এসব নাম অনেকের কাছেই খুব বেশি অপরিচিত মনে হতো।

প্রসঙ্গ অবতারণা

মানুষ তার আপন অস্তিত্বের কথা ভাবে। ভাবনা-চিন্তা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করতে চায় জীবনকে। এই চাওয়ার প্রথম ফল হলো ধর্ম। ধর্ম মানুষের জীবনে ও ইতিহাসে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে।

নানাদিক থেকেই ধর্ম ও শিল্পকলার সম্বন্ধটা কাছের। আদিম গুহাবাসী মানুষের জীবন থেকেই ধর্মবিশ্বাস শিল্পকলাকে প্রভাবিত করেছে। ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন বিভিন্নভাবে ঘটেছে শিল্পকলার মধ্যে। শিল্পকলা হয়েছে ধর্ম প্রচারের বিশেষ সহায়।

অতীতে শিল্পকলার ও ধর্মের বিকাশ ঘটেছে এক সূত্রে। যখন জগতে কোনো নতুন ধর্মমতের আবির্ভাব ঘটেছে, তখন সেই ধর্মমতকে কেন্দ্র করে শিল্পীরা অনুভব করেছেন নতুন ধরনের কিছু সৃষ্টির। ফলে শিল্পকলা নিয়েছে বিশিষ্ট মোড়। তাই ধর্মের সাথে যুক্ত করে শিল্পকলার ইতিহাস আলোচনা অর্থহীন নয়। ধর্ম মানুষের আচার-আচরণে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। ফলে স্বাতন্ত্র্য লাভ ঘটেছে একটি বিশিষ্ট ধর্মে বিশ্বাসী জনসমষ্টির মধ্যে উদ্ভূত শিল্পকলার।

যাকে ইসলামী শিল্পকলা বলে, তা গড়ে উঠেছে ইসলামধর্মী মানুষের মধ্যে, তাদের দ্বারা এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতায়। নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও এই শিল্পকলার আছে কতকগুলো সাধারণ লক্ষণ। ধর্ম-চেতনার মিল ও নানা ঐতিহাসিক ঘটনার যোগাযোগের ফলে দেখা দিয়েছে এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো।

ইসলাম শব্দের অর্থ বশ্যতা। ধর্মগত অর্থে, স্রষ্টার বা আল্লাহর প্রতি বশ্যতা। তাঁর নির্দেশ মানা। হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে শেষ নবী বলে স্বীকার করা ও কুরআন ও হাদিসের অনুসরণ করা। নবী শব্দটা হিব্রু (এসরু) ভাষার। শব্দগত অর্থে বার্তাবাহী। ধর্মগত অর্থে স্রষ্টার নির্দেশবাহী। অবতারবাদের সাথে এই ধারণার তফাৎ আছে। অবতার বলতে বুঝায় আল্লাহর শক্তির অংশ ধারণকারী অতিমানব। কিন্তু নবী তা' নন। তিনি কেবল আজ্ঞাবাহক। তিনি সাধারণ মানুষেরই একজন।

মুসলিম বলতে বুঝায় ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীদের। মুসলিম শব্দটা আরবি, ইসলাম শব্দের বিশেষণ।[১] ফারসি ভাষায় মুসলিম শব্দটা রূপান্তরিত হয়ে হয়েছে মুসলমান। মুসলমান শব্দটাই আমাদের দেশে বেশি চলে।

---

[১] শব্দটা আমরা বিশেষ্য হিসাবে ব্যবহার করি।

ধর্ম হিসেবে ইসলামের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। ইসলামে স্রষ্টা নিরাকার। তার কোনো চিত্র বা মতি রচনা চলে না। এক ঈশ্বরবাদী ইসলাম ধর্মে কোনো দেবদেবীর ছবি ও বিগ্রহ বানাবার অবকাশও নেই। এই ধর্মে, ধর্মের চাইতে ধর্মের নবীর ব্যক্তিত্বকে বড় করে তুলবার, পূজা করবার চেষ্টা করা হয়নি অন্য ধর্মের মতো। এই ধর্মে ধর্মীয় কারণে সৃষ্টি হতে পারেনি অন্য ধর্মের মতো পুরোহিততন্ত্র। অন্য ধর্মের তুলনায় এই ধর্মের ক্রিয়াকাণ্ড অনেক সরল। ইসলাম ধর্মকে ধর্ম হিসেবে বলা যায় অ্যাব্স্ট্রাক্ট্ (Abstract) বা নির্বস্তুক। তাই এই ধর্মে বিশ্বাসীদের মধ্যে যে শিল্পকলার উদ্ভব ও লালন চলেছে তাও মূলত নির্বস্তুক। এর প্রাণকেন্দ্র মণ্ডন বা নকশা কলা। স্বভাবের অনুকরণে প্রতিরূপ সৃষ্টির চেষ্টা এই শিল্পে প্রশ্রয় পায়নি–যদিও বা কিছু বতিক্রম ঘটেছে মাঝে মাঝে, কোনো কোনো অঞ্চলে।

ইসলামী বা মুসলিম শিল্পকলা বলতে সাধারণভাবে বুঝায় খ্রিষ্টীয় সপ্তম থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত অঞ্চলের জনসমষ্টির মধ্যে গড়ে ওঠা শিল্পকলা। অনেক খ্রিষ্টান শিল্পী ও কারিগরের অবদান আছে এই শিল্পকলার পেছনে। কিন্তু এসব শিল্পীকেও কাজ করতে হয়েছে মুসলিম পৃষ্ঠপোষকতায়-তাদের রুচি ও ধারণার প্রয়োজনে। খ্রিষ্টীয় দশম থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে এর চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে। সপ্তদশ শতকের পর থেকে এই শিল্পকলায় অবনতি এসেছে।

মুসলিম শিল্পকলার কতকগুলো সাধারণ লক্ষণ আছে। আবার আছে আঞ্চলিক, জাতিগত ও সময়ের ব্যবধানজনিত পার্থক্য। এসব কারণে ইসলামী শিল্পকলার ইতিহাসকেও বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে আলোচনার প্রয়োজন হয়। এছাড়া পৃষ্ঠপোষকতা (Patronage) চিরকালই শিল্পকর্মকে প্রভাবিত করেছে। তাই শিল্পকলার ইতিহাসকে ভাগ করবার একটা সহজ রীতি হলো পৃষ্ঠপোষকদের নাম দিয়ে। শাসকচক্রই অতীতে শিল্পের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাদের পছন্দ আর রুচি অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে শিল্পকর্ম।

তাই শিল্পকলার ইতিহাস আলোচনা করা হয় সাধারণত শাসকগোষ্ঠীর উত্থানপতনের ইতিহাসের সাথে যোগাযোগ করে, রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার সাথে সংগতি রেখে। আমরা এই প্রচলিত ধারাই প্রধানত অনুসরণ করব বর্তমান আলোচনায়।

সব শিল্পকর্মকেই ভালোভাবে বিচার করতে হলে তা বিচার করতে হয় ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে। ইসলামী শিল্পকলার কথা যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হলেও জানতে হয় তার অতীত পটভূমির কথা। কোনোকিছুকে ব্যাখ্যা করা মানে তার উৎপত্তি ও পরিণতির কথা বলা। এ ছাড়া, কোনোকিছুকে বুঝতে হলে তুলনামূলক আলোচনাও করতে হয়। তুলনার মাধ্যমে কোনোকিছুর বৈশিষ্ট্যকে ব্যক্ত করা সহজ। আমাদের আলোচনা তাই আরম্ভ হয়েছে ইসলামী শিল্পকলার সাথে অন্য শিল্পকলার তুলনা দিয়ে। এরপর আমরা সংক্ষেপে বলেছি ইসলামী শিল্পকলার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা।

তারপরে আমরা দিয়েছি ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে খুব সংক্ষিপ্ত রূপরেখা। পরে আমরা আলোচনা করেছি এই শিল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন ধারার কথা।

শিল্পকলার ইতিহাস আলোচনায় একটা প্রশ্ন স্বভাবতই আসে : শিল্প (Art) কাকে বলে? কয়েক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর হয় না। আর গোড়াতেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আলোচনা জটিল হয়ে ওঠে। তবে দু'একটি কথা বলে রাখা দরকার :

শিল্পকর্মকে চারু ও কারু, এই দুই ভাগে ভাগ করে আলোচনা করার রেওয়াজ আছে। চারুশিল্প বলতে বুঝায় ছবি আঁকা, মূর্তি গড়া, স্থাপত্য, সংগীত, কবিতা প্রভৃতিকে। এখানে মানুষের কল্পনাশক্তির প্রয়োজন খুবই বেশি। অন্যদিকে কারুশিল্প বলতে বুঝান হয় সেইসব শিল্পকর্মকে, যেখানে কল্পনার চাইতে কারিগরি দক্ষতার প্রয়োজন অধিক এবং যেসব শিল্পকর্মের লক্ষ্য কেবল আমাদের শিল্পবোধ তৃপ্ত করা নয়–আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানা ব্যবহারিক প্রয়োজন পূরণ। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায় কাঠের আসবাব, ধাতুর পাত্র ইত্যাদির কথা। কিন্তু চারুকলা (Fine Arts) ও কারুকলার (Crafts) এই শ্রেণিবিভাগ বহুল অংশেই কৃত্রিম। আসলে সব শিল্পকলার লক্ষ্য এক– মনোহর কিছু সৃষ্টি। শিল্পকলার সাধনা মনোহরের সাধনা। একটা কম্বলের গায় নকশা না করলেও তা দিয়ে শীত নিবারণ চলে। কিন্তু তবু তাতে নকশা তোলা হয়, তাকে মনোহর করবার জন্য। মনোহরের বোধই হলো শিল্পবোধ (Aesthetic Sense) যা কিছুর মধ্যে শিল্পবোধের স্পষ্ট পরিচয় আছে তাই হলো শিল্পবস্তু। আমরা এই বইতে চারু ও কারু শিল্পের বিভাগ না মেনে হাতে গড়া চোখে দেখবার সব শিল্পবস্তুকে একত্রে আলোচনা করব। কারণ ইসলামী শিল্পকলার ক্ষেত্রে চারু ও কারুর বিভাগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কষ্টসাপেক্ষ ও অপ্রয়োজনীয়, যেসব শিল্পকর্মকে সাধারণত চিহ্নিত করা হয়[২] 'ইসলামী' বলে, আমরা তাদের কথা আলোচনা করব এই ছোট বইটিতে সংক্ষেপে– ইতিহাসের পারম্পর্যে সাজিয়ে।

আমরা শিল্প কথাটি ব্যবহার করেছি দুটি খুব কাছাকাছি অথচ ভিন্ন অর্থে। আমরা শিল্প বলতে যেমন বুঝেছি সুন্দর সামগ্রি তৈরির নৈপুণ্য (skill)-কে, তেমনি আবার বুঝেছি দক্ষতা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী সৃষ্ট সুন্দর সামগ্রিকে। শিল্পকলা শব্দটিও ব্যবহার করা হয়েছে এমনি দ্বিবিধ অর্থেই।

---

২ একটা সুন্দর গালিচাকে চারু না কারু কলার নিদর্শন হিসাবে গণ্য করবো!

প্রথম অধ্যায়
প্রাচী ও প্রতীচী

মানুষের ইতিহাসকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়: আদিম (primitive) ও সভ্য (civilized)। সভ্যযুগের শিল্পকলাকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা চলে। যে শিল্পধারা গড়ে উঠেছে এশিয়ার মাটিতে, তাকে বলা হয় প্রাচ্যশিল্প (oriental art)। অন্যদিকে যে শিল্প গড়ে উঠেছে ইউরোপকে কেন্দ্র করে, তাকে বলা হয় প্রতীচীর শিল্পকলা (cceidental art)। প্রাচ্যের শিল্পকলা মূলত মণ্ডন বা অলংকরণ-ঘেঁষা। কিন্তু পাশ্চাত্যের শিল্পকলায় জিনিসের স্বাভাবিক আকৃতি ও পরিমাপ বজায় রেখে বস্তুঘেষাভাবে ছবি আঁকা ও মূর্তি গড়ার চেষ্টা হয়েছে। প্রাচ্যের শিল্পকে প্রধানত বলা যায় মণ্ডনবাদী (decorative)। পাশ্চাত্যের শিল্পকে বলা চলে স্বভাববাদী (naturalistic)

গ্রিক শিল্পকলা

স্বভাববাদের জন্ম হয় গ্রিসে। প্রাচীনকালের গ্রিকদের আঁকা কোনো ছবির নিদর্শন এখন আর টিকে নেই। তবে গ্রিক রূপকথা থেকে এই সময়কার চিত্রকলা সম্পর্কে অনেক কিছু অনুমান করা চলে। গ্রিক শিল্পী জিউক্সিস সম্পর্কে গল্প আছে: জিউক্সিস একবার একটা ছবি আঁকেন যার বিষয় ছিল, একটা ছেলে এক থোকা আঙ্গুর নিয়ে যাচ্ছে। আঙ্গুরগুলো দেখতে এতই স্বাভাবিক হয়েছিল যে পাখিরা উড়ে এসে তাতে ঠোকর দিতে চাইত। কিন্তু এ ছবির সমালোচনা হয়। বলা হয়, ছবির আঙ্গুরগুচ্ছ যত স্বাভাবিক হয়েছে, ছেলেটি তা' হয়নি। হলে পরে পাখিরা উড়ে এসে আঙ্গুর-থোকায় ঠোকর দিতে সাহসী হতো না। জিউক্সিস ছিলেন খৃটের জনেরি চারশত বছর আগের লোক। জিউক্সিস-এর সময় আর একজন বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন। তার নাম পারাসিয়াস। জিউক্সিস-এর সাথে হয়েছিল তাঁর ছবি আঁকবার প্রতিযোগিতা। পারাসিয়াস তার ছবি আনলেন। ছবির সামনে একটা পর্দা টানা। জিউক্সিস বললেন, পর্দাটা সরিয়ে আপনি আপনার ছবিটি আমাকে দেখান। পারাসিয়াস বল্লেন, পর্দাটাই আমার ছবি। পর্দার পিছনে কোনো ছবি নেই। এসব গল্প থেকে অনুমান করা চলে প্রাচীন গ্রিকরা ছবি আঁকত খুবই বস্তুঘেঁষাভাবে, স্বাভাবিক আকার-আকৃতির বিকৃতি না ঘটিয়ে। গ্রিকরা মানুষের মূর্তি গড়তে খুব ভালোবাসত। এসব মানুষের মূর্তির মধ্যে গ্রিকরা দিতে চেয়েছে সুঠাম সুন্দর মানুষের স্বাভাবিক রূপ। এসব মূর্তির অনেক নিদর্শন আজও টিকে আছে। গ্রিকদের এই শিল্পধারা আলেকজেন্ডার-এর (খ্রি. পূ: ৩৫৬ ৩২৮) সময়ে ছড়িয়ে পড়ে নিকটপ্রাচ্যে (Near East) ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে। গ্রিক শিল্পধারা খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতক থেকে

বিশেষ রূপ পেতে থাকে। এসময় গ্রিক জীবন হয়ে ওঠে বিশেষ ভাবে বিলাসী ও ভোগবাদী। এ সময়কার তৈরি মূর্তিতে তাই দেখতে পাওয়া যায় রিরংসা আর তাকে ঘিরে নানা ভোগবাদী আবেগের অভিব্যক্তি। আসল গ্রিক মূর্তি অনেক আবেগশূন্য। তার মধ্যে ফুটে উঠেছে নরনারীর দেহের আদর্শ আঙ্গিকরূপ। কিন্তু এসব মূর্তির মধ্যে নেই সেই সুঠাম ভাব। মেয়েদের মূর্তির মধ্যে ফুটে উঠেছে বিশেষ মেয়েলি ভাব আর খুবই উগ্র আবেগ। গ্রিক শব্দটা লাতিন। গ্রিকরা নিজেদের দাবি করতেন, প্রাচীন রাজপুত্র হেলেন-এর বংশধর বলে। তাই তাঁরা নিজেদের বলতেন হেলেন। প্রাচীন গ্রিকশিল্পকে তাই বলা হয় হেলেনী (Hellenic) শিল্প। আর আলেকজেন্ডারের পরবর্তী যুগে গ্রিক প্রভাবিত গ্রিক অনুসারী শিল্পকে বলা হয় হেলেনীধর্মী শিল্প (Hellenic Art)।

রোমনি শিল্প-ধারা

গ্রিকদের পরে ঘটে রোমান সভ্যতার অভ্যদয়। এ যুগের মূর্তি ও চিত্রকলাও বাস্তবধর্মী। এ যুগের মূর্তিকলায় ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বা বৈশিষ্ট্যকে রূপ দেবার চেষ্টা হয়েছে। কেবল মানবদেহের আদর্শ সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়নি। রোমান আমলে দেয়ালের গায় অনেক ছবি আঁকা হতো। এসব ছবির অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে চাপা পড়া পম্পাই শহরের মাটি খুঁড়ে পাওয়া দালানের দেওয়ালের গায়। এসব ছবি খুবই বস্তুঘেঁষা। স্বাভাবিক আকার-আকৃতির অনুসরণ করে আঁকা। এসব ছবিতে বড়, ছোট, কাছে, দূরে ও আলোছায়ার প্রভাব দেখান হয়েছে। অর্থাৎ এসব ছবিতে কেবল দৈর্ঘ্য প্রস্থের ধারণা পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় বেধের (depth) ধারণাও।

পরিপ্রেক্ষিত (perspective) বলতে বুঝায় অঙ্কন-বিদ্যার বিশেষ কৌশল, যার দ্বারা পদার্থের বেধ বা ঘনত্ব (depth); প্রকৃত দূরত্ব ও আকার বুঝান যায়। পরিপ্রেক্ষিত দুই ধরনের। এক রকম পরিপ্রেক্ষিতকে বলা হয় বায়বীয় পরিপ্রেক্ষিত (areal perspective) আর অপর পরিপ্রেক্ষিতকে বলা হয় রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত (linear perspective)। গ্রিক আর রোমানদের এই দু'ধরনের পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে জ্ঞান ছিল।

উঁচু জায়গায় আলো পড়ে বেশি। নিচু জায়গায় আলো পড়ে কম। নিচু জায়গা অন্ধকার দেখায়। কাছের জিনিসকে দেখায় স্পষ্ট। কিন্তু দূরের জিনিসকে দেখায় দূরত্ব অনুসারে অস্পষ্ট। রঙকে গাঢ় করে হাল্কা করে এবং আলোছায়ার প্রভাব দেখিয়ে ছবিতে কাছে, দূরে ও উঁচু-নিচু বুঝান যায়। এভাবে কাছে-দূরে ও উঁচুনিচু বুঝানোর কায়দাকে বলা হয় বায়বীয় পরিপ্রেক্ষিত।

কোনোকিছুকে চোখের কাছে থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে থাকলে তাকে ক্রমশ ছোট দেখাতে থাকে। একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে বাইরে নিয়ে গেলে আর তাকে দেখাই যায় না। যে বিন্দুর থেকে কোনো বস্তুকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলে আর তাকে দেখাই যায় না তাকে বলা হয় বিলিন-বিন্দু (vanishing point)। ছবিতে কাল্পনিক বিলিন বিন্দুর কথা ধরে

নিয়ে তার সাথে সংগতি রেখে কোনো জিনিসের কাছের অংশকে বড় করে ও দূরের অংশকে পরিমাণ মতো ছোট করে আঁকলে ছবিতে কাছে, দূরের ও গভীরতার বোধ জানা যায়। প্রত্যেক বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ আছে বলে মনে হয়, সব কিছুকে বুঝানো যায় ত্রিমাত্রিক (three dimentional) বলে।

হেলেনীধর্মী শিল্পের প্রভাব যেসব প্রাচ্য দেশে পড়ে, সেখানে এই তিন মাত্রার ধারণা অনেক শিল্পকর্মে দেখা যায়। কিন্তু প্রাচ্যের শিল্পকলা মোটের ওপর পরিপ্রেক্ষিত বিহীন। এই শিল্পকলাকে বলা যায় পরিপ্রেক্ষিতবিহীন শিল্পকলা। এই শিল্পকলা বিশেষভাবেই দুই মাত্রিক (two dimentional) অর্থাৎ কেবল দৈর্ঘ্য ও প্রস্থযুক্ত, বেধযুক্ত নয়।

ইউরোপের শিল্পকলা থেকেও এক সময় আস্তে আস্তে পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ করে রৈখিক পরিপ্রেক্ষিতের জ্ঞানবাদ পড়তে থাকে। কিন্তু ইউরোপীয় শিল্পকলায় স্বাভাবিকতাবাদ (Naturalism) নতুন করে ফিরে আসে নবজাগৃতির (renaissance) সময় অর্থাৎ পঞ্চদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে।

প্রাচ্যের শিল্পকলা

প্রাচ্যের শিল্পকলা চিরদিনই প্রায় থেকেছে মণ্ডন ঘেঁষা।[১] গ্রিক ও রোমের প্রভাব এর ওপর স্থায়ী হতে পারেনি। কেন যে হতে পারেনি, তার কোনো ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা এখনও পাওয়া যায়নি। চীনদেশের শিল্পীরা অবশ্য জীবজন্তুর ছবি এঁকেছেন অনেক স্বাভাবিকভাবে। চীনা শিল্পীদের আলোছায়ার ও বায়বীয় পরিপ্রেক্ষিতের জ্ঞান ছিল। কিন্তু রৈখিক পরিপ্রেক্ষিতের জ্ঞান ছিল না। প্রাচীন চীনা নিসর্গ চিত্র (land scape) বিখ্যাত। কিন্তু এসব ছবিতে দূরের জিনিসকে ছোট করে বিলিন বিন্দুর সাথে সংগতি রেখে আঁকা হয়নি। দূরের জিনিসকে আঁকা হয়েছে কাছের জিনিসের উপরে। দেখে মনে হয়, এসব নিসর্গ চিত্র (land scape) যেন আঁকা হয়েছে উঁচু জায়গা থেকে অবলোকন করে। চীনাদের সাথে পাশ্চাত্য শিল্পীদের আর এক তফাৎ; চীনা শিল্পীরা খুঁটিনাটি সবকিছু আঁকতে চাননি। নিসর্গ চিত্রে দেখা যায় অনেক সময় চীনা শিল্পীরা রেখে দিয়েছেন অনেকটা ফাঁকা জায়গা। কিছুই আঁকেননি সেখানে। এর কারণ, কোনো চীনা শিল্পীর যতটুক, ভালো লেগেছে কোনো দৃশ্যের ততটুকুই তিনি একেছেন। পাশ্চাত্য শিল্পী সব কিছু আঁকতে চেয়েছেন; কিন্তু চীনা শিল্পী চাননি কোনোকিছুর বিস্তারিত বিবরণ দিতে।

---

১ অলিপনা, কার্পেট, জালিকা কাজ, বিভিন্ন দ্রব্যের উপর নকশা, যা কেবল স্থান বিশেষ বা বস্তু বিশেষকে মণ্ডিত বা অলংকৃত করার জন্য করা হয়, তাকে বলা হয় মণ্ডন বা অলংকরণ শিল্পকলা প্রাচ্য শিল্পে মানুষ বা প্রাণীর মূর্তি গড়ার সময় দেহের বিভিন্ন অঙ্গের পরিমাণ (proportion) ও আকৃতি বজায় রাখা হয়নি। এসব মূর্তির সাথে আসল জিনিসের চেহারা ঠিক মেলে না। এই মূর্তিকলাও নকশীকলার পথ অনুসরণ করছে। তাই তাকেও বলা যায় মণ্ডন ঘেঁষা বা অলংকারিক (দ্র. নন্দলাল বসু, *শিল্পকথা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩৫১, পৃ. ৩০।

চীনা কবিতার মতো চীনা ছবির বক্তব্য সংক্ষিপ্ত। কিন্তু এর ব্যঞ্জন! অনেক গভীর। উক্তের চেয়ে অনক্তের প্রভাব এ ক্ষেত্রে যেন বেশি।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিল্পকলার তুলনা করতে যেয়ে পরলোকগত অধ্যাপক, এরিক নিউটন বলছেন: ইউরোপীয় শিল্পের বিষয়, চোখ যা দেখেছে তাই। কিন্তু প্রাচ্যের শিল্পের বিষয়, মন যা জেনেছে তাই।[২]

ইসলামী শিল্পকলা

ইসলামী শিল্পকলা প্রাচ্যের সনাতন নকশাকার ঐতিহ্যবাহী। এ শিল্পও বিশেষভাবে নকশাধর্মী বা মণ্ডনপ্রবণ। ফুল, লতা, পাতা, গুল্ম ও বিভিন্ন জ্যামিতিক আকার-আকৃতিকে নিয়ে এই নকশাকলা গড়ে উঠেছে। এই নকশাকলার ওপর আছে প্রাচ্যের বিভিন্ন নকশাকলার প্রভাব। ইসলামী শিল্পকলায় রঙকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়েছে আলোছায়া বিহীনভাবে। রঙ হয়েছে এক্ষেত্রে মনেরই (decoration) বিশেষ অঙ্গ।

হজরত মুহাম্মদের (সা.) (৫৭০-৬৩২ খ্রি.) সময় আরব উপদ্বীপে ছিল দু'ধরনের লোক। একদল ছিল নিছক মরুচারি যাযাবর। যাদের বলা হয় বেদুইন। আর একদল লোক থাকতো মক্কা ও মদিনার মতো শহরে। এসব শহরের লোকসংখ্যা ছিল পনের কুড়ি হাজারের মতো। দেশ বিদেশে ব্যবসা করতে যেত এসব অঞ্চলের লোক। মক্কা ছিল বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র। এখানকার কাবা মন্দিরে তীর্থ করতে আসত অনেকদূর থেকে আরবরা। প্রতি বছর মক্কার কাছে ওকাজ (Okaz) বলে একটা জায়গায় বিরাট মেলা বসত। এই মেলায় অনেক কবির সমাগম হতো। এসব কবিরা শ্রোতাদের আবৃত্তি করে শোনাতেন তাদের কবিতা। এই সময়কার আরবি অনেক কবিতা ছিল খুবই উন্নতমানের। কবিদের পুরস্কৃত করা হতো মেলায়। এইভাবে আরবি কবিরা উৎসাহ পেতেন। যেসব কবিরা প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হতেন তাদের অনেকের কবিতা উৎকীর্ণ করা হতো কাবা মন্দিরের প্রাচীরের গায়। এমনিভাবে উৎকীর্ণ সাতটি কবিতা এখন পর্যন্ত টিকে আছে।[৩]

কিন্তু আরবি শিল্পকলা কি রকম ছিল সে সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায় না। তবে আরবরা যে নানারকম ফুল, লতাপাতা দিয়ে নকশা আঁকত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আরবরা আঙ্গুরলতার নকশা করত নানাভাবে। চেরা পাতা যুক্ত পাক খাওয়া আঙ্গুরলতা ছিল এদের নকশাকার বিশেষ উপাদান। পরবর্তী যুগে ইসলামী বিশ্বে নকশাকলা বিশেষ জটিল হয়ে ওঠে। ফুল, লতাপাতা ও জ্যামিতিক আকার-আকৃতি দিয়ে করা ইসলামী বিশ্বের বৈশিষ্ট্যসূচক নকশাকলাকে সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়

---

[২] Europian Painting and Sculpture, Eric Newton, A Pelican

[৩] Book. 1941. Ry. The Arabs, E. Atizah (page 21). A pelican Book (1953)

আরাবেস্‌ক্ (Arabesque) বলে। আরাবেস্‌ক্ শব্দটা ফরাসি। শব্দগত অর্থে আরবদের মতো। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আরাবেস্‌ক্-এর মূল উপাদান চেরা পাতা যুক্ত আঙ্গুরলতা। অনেকের মতে ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে প্রাচীন আরবের আঙ্গুরলতাই পরিশ্রুত হয়ে জন্ম দিয়েছে ইসলামী বিশ্বের সুপরিচিত নকশাকলা আরাবেস্‌ক্ (Arabesque)।[৪]

ইসলামী নকশাকলার আর একটি বড় উপাদান হলো লিপিকলা (Calligraph)। প্রাচীন আরবি লিপির ছিল দুটি প্রকারভেদ। একটি প্রকারভেদকে ব্যবহার করা হতো নরম কোনোকিছুর ওপর লেখার জন্য। অন্য প্রকারভেদটি ব্যবহৃত হতো শক্ত কোনোকিছুর ওপর লেখার জন্য। এই শেষোক্ত লিপিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে প্রসিদ্ধ ইসলামী লিপিকলা অর্থাৎ ইসলামী শিল্পকলা স্বয়ম্ভু কিছু নয়। এর পেছনে আছে প্রাচীন প্রাগ-ইসলামী আরবের দান। আমরা এর পরের অধ্যায়গুলোতে দেখব এই শিল্পকলার পেছনে আছে আরও বহু শিল্পকলার দান।

---

৪ Encyclopaedia of World Art- Islamic Art প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। প্রকাশক, Mc Growhill Book companz Inc, NewYork, 1965.